ছাড়ার সময় তো এত তক্‌লিফ হয়নি। আসলে ‘ছে-ছে ভাই-এর লড়াই ঝগড়া’ দেখতে দেখতে বাপুজি খেতি-বাড়ি ভাগ-বাঁটোয়ারার পর সবাইকে আপনা আপনা রাস্তা নাপতে বলেছিল। রামঅবতার কোনও কূল-কিনারা না পেয়ে ইয়ার-দোস্তদের কাছে গিয়েছিল। ওদের পরামর্শেই ফুলমতি আর চার বছরের রামধনিয়াকে নিয়ে সোজা বাংগাল কি ন্যু জলপাইগুড়ি। তারপর ইস্কুলবাসের খালাসি হয়ে শহর-জীবন শুরু। ফুলমতি দু’টো বাড়িতে বর্তন ধোয়া, সাফ-সুতরো করার কাজ কলেও সবাই ওদের ইজ্জত দিত। আর জাতভাইদের তো কথাই নেই। গরিবি থাকলেও এত মিল-মুহব্বত-এ সুখ যেন টলটল করছিল। আফশোস খালি, রামধনিয়াটকে একটু ভৈঁসা ঘি-দুধ, জওয়ার-বাজরা কী রোটির তাকতটা দিতে পারল না। বাংগাল মে উসব কাঁহা মিলবে!

– ‘কী হল, কী বিড়বিড় করছ দাদু, সন্ধ্যাদির বানানো পরোটা তোমার পছন্দ হল না বুঝি? নাও, নাও, তাড়াতাড়ি সারো। আমাদের আবার যেতে হবে যে!’

– অপ্রস্তুত রামঅবতার অপরাধীর মতো বীণাপাণির দিকে তাকিয়ে থালাটা টেনে নেয়।

ওদিকে বাইরে বড়দিদিমণির গলা বেশ চড়া, ‘দিনেই শুধু দেখাশোনা করলে চলবে না রামসিংহাসন! এই যে লিচুগাছটা কাটা পড়ল, মাঝে মাঝে ফুলের টব চুরি যাচ্ছে! কোনওদিন দরজা ভেঙে বড় ধরনের চুরি হয়ে যাবে। তখন সামলাবে কে?’

সন্ধ্যা এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বীণাপাণিকে বলে, ‘আজ বড়দিমণির মেজাজটা টং-এ চড়ল কী করে রে বীণা?’

বৃষ্টিধারায় স্নান করছে গাছগাছালি। বড়দিদিমণি ম্যাডাম সুবর্ণা চৌধুরির ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে তার মাথায় বর্ষা যেন নৃত্য শুরু করেছে। দৌড়ে তিনি পায় হয়ে আসেন অফিসঘর, গাড়ি বারান্দা।

রামসিংহাসন চেঁচিয়ে বলে, ‘রসুই ঘর খুলাই আছে ম্যাডাম ভিতরে ঘুসে যান।’

প্রকৃতি কারও লাভ-ক্ষতি, রাগ-অনুরাগের তোয়াক্কা করে না। হয় সে মানুষের কাছে পরম সোহাগে নিজেকে ঢেলে দেয়, নয় ভয়ংকরী নারীর প্রতিশোধ স্পৃহার মতো তছনছ করে ফেলে জগৎ সংসার।

গ্রীষ্মের বিকেলের এই একপশলা প্রবল বর্ষণ এ অঞ্চলে নতুন নয়। তবুও প্রতিদিনই তা কারও না কারও জীবনে আচমকা চমক অথবা দুঃখের মুহূর্ত আনে।

মাথা বাঁচাতে মিড্‌ ডে মিলের অন্ধকার রান্নাঘরের বারান্দাতেই বড়দিদিমণি নিজেকে স্থাপন করেন। রামঅবতার হাতের ঈশারায় সন্ধ্যাকে আলো জ্বালাতে বারণ করে। কিন্তু ঠিক তখনই আকাশ ফেটে বাজ পড়ে কড়কড় শব্দে। তীব্র বিদ্যুৎঝলক চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে ঘোষণা করে তার রুদ্রপ্রতাপ। ভয়ে বড়দিদিমণি বারান্দা থেকে রান্নাঘরের ভিতরেই ঠেলে ওঠেন।

রামসিংহাসন তুরন্ত তার পাশে রাখা টুলটা এগিয়ে দেয় – আর তাতেই সব যেন যায় তালগোল পাকিয়ে। ভূত দেখার মতো চমকে ওঠেন চৌধুরি ম্যাডাম। ঝাঁঝিয়ে বলেন, ‘কে ওখানে? সন্ধ্যা! বীণা! এই অন্ধকার ঘরে তোমরা এ কাকে নিয়ে বসে আছ?’

মুহূর্তে রামঅবতার ভুলে যায় রামসিংহাসনের লাল চোখ, ভুলে যায় নিজের অসহায় জীবনের কথা। লাইটের সুইচ টিপে আলোয় ঘর ভরিয়ে

মাথা বাঁচাতে মিড্‌ ডে মিলের অন্ধকার রান্নাঘরের বারান্দাতেই বড়দিদিমণি নিজেকে স্থাপন করেন। রামঅবতার হাতের ঈশারায় সন্ধ্যাকে আলো জ্বালাতে বারণ করে। কিন্তু ঠিক তখনই আকাশ ফেটে বাজ পড়ে কড়কড় শব্দে। তীব্র বিদ্যুৎঝলক চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে ঘোষণা করে তার রুদ্রপ্রতাপ। ভয়ে বড়দিদিমণি বারান্দা থেকে রান্নাঘরের ভিতরেই ঠেলে ওঠেন

– ‘চড়বে না? রামুদা কি কিছু দ্যাখে নাকি? টিফিনের সময় পাঁচিলের উপর দিয়ে মেয়েদের কুড়কুড়ে বেচবে, না গেটের খেয়াল রাখবে?’

বীণাপাণির কথায় রামঅবতার হাতের লাঠিটা দ্যাখে। পাকা বাঁশের তেল মাখানো লাঠি। ভাবে, চারবচ্ছর হল ফুলমতিয়া তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। ওই ফুলমতিই দেশ ছেড়ে আসার সময় ওটা সঙ্গে করে এনেছিল।

– এদিকে এখানে আসার পর তিনগো খানেওয়ালা বেড়ে ঔর তিন। দিনে বাস, রাতে চৌকিদারি। তখন থেকে এই লাঠিই তার দোস্ত। শীত হোক, বারিষ – সে যখন পাহারা দিত তখন এই ইস্কুলবাড়ির একটা ভাঙা ইটও কেউ সরাতে পারেনি আর এখন? – তারই জোয়ান মরদ বেটা আপনা কাম ছোড়ে দিয়ে রুপিয়া কামাতে লেগেছে! – ‘বেইমান কাঁহিকা, আরে তোহর বাপুকো মান-ইজ্জত ভি খেয়াল করলি না?’

রাগে দুঃখে রামঅবতারের মুখ কালো হয়ে যায়। আকাশেও তখন কালো মেঘের ঘনঘটা। ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু হয়েছে। ধুলো উড়িয়ে শনশনে হাওয়ার ভিতর উত্তপ্ত পৃথিবীও যেন রাগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। মেঘের মন্দ্রিত হুংকার গ্রাস করতে শুরু করেছে বাড়িঘরের উন্মুক্ত আঙিনা। নেমে আসছে তীক্ষ্ণধার বর্শার ফলার মতো মেঘের শত সহস্র সেনানী।

প্রবল বৃষ্টিধারায় স্নান করছে গাছগাছালি। প্রবল বলে – ‘দিদিমণি, হামি রামঅবতার আছে। আপনে মুঝে প্যাহাচানা নেহি? ঈ সন্ধিয়া আর বীণাপাণি তো হামরি বিটিয়া বরাবর আছে। আচানক্‌ হামি ইস্কুলমে ঘুসলাম তো থোড়াসা চায় পিলাকে বাতচিত করছে।’

বড়দিদিমণি দু’মিনিট রামঅবতারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, ‘ও রামঅবতার! তাই বলো। তা এই অন্ধকার ঘুপচিতে লুকিয়ে বসে আছো কেন?’

বড়দির কথায় সন্ধ্যা সাহস পায়। বলে, ‘লুকিয়ে থাকবে না তো কী করবে? এখানে এসেছে জানলে রামসিংহাসন দাদা কি আর বুড়াকে আস্ত রাখবে?’ ম্যাডাম সুবর্ণা চৌধুরি একজন দক্ষ প্রশাসিকা। যে কোনও সমস্যাতেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বলেন, ‘তাই বুঝি? তা হলে আগের মতো রাতপাহারার কাজটা তুমিই করো রামঅবতার। স্টোররুমের পাশের ঘরটা তোমার, কী রাজি তো?’

– ইতনি চিঙ্গারিয়াঁ বরষনে কে বাদ ভি দিদিমণি তাকে কাজ দিল! – বিহ্বল রামঅবতারের মুখে কথা সরে না। শুধু ছলছল চোখে সে কপালে হাত ঠেকায়, কার উদ্দেশে বোঝা যায় না – সর্বশক্তিমান ঈশ্বর? না বড়দিদিমণি?

(অঙ্কন-অভি)

অণুগল্প

ঘুণ

রিমা সান্যাল

সুমনা বিয়ের পর খুব শখ করে একটা কাঠের শো’কেস বানিয়েছিল। বিয়ের পর বারো বছর পর্যন্ত সেটা বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু তারপর সেটাতে ঘুণ ধরতে শুরু করে। ঘুণপোকা শো কেসটাকে আস্তে আস্তে কুরে কুরে খেতে খেতে একেবারে ফোঁপরা করে ফেলছিল। সুমনা ওর স্বামী দীপককে একদিন বলল, শো’কেসটাতে ঘুণ ধরেছে, দোকানে নিয়ে গিয়ে আবার যদি বার্নিশ করে নিয়ে আসা যায়, তা হলে হয়তো ওটা ঠিকে যাবে।

কিন্তু দীপক সুমনার কথায় আমল দেয়নি। এ সব বিষয়ে তার খেয়াল খুব কম। আবার কিছুটা অলসতাও আছে। তার এক কথা, ‘ঘুণ যখন ধরেছেই তখন ওটাকে বাতিল করে একটা নতুন নিয়ে আসা যাবে। এখন তো বাজারে অনেক আধুনিক ডিজাইনের শো’কেস পাওয়া যায়।’

কিন্তু সুমনা জানে, ওর আসলে ইচ্ছেই নেই। ওদের মেয়ে রায়া একদিন বলল, ‘বাবা, এই শো’কেসটা মায়ের খুব প্রিয়। মা যখন বারবার করে বলছে, তুমি এটাকে একবার বার্নিশ করেই আনো না।’

মেয়ের কথা ফেলতে পারল না দীপক। সে একটু অসন্তুষ্ট হলেও বাইরে গেল, একটা ঠেলাগাড়ি ডেকে আনত। সুমন শো’কেসটা সব জিনিসপত্র নামিয়ে ওটাকে ফাঁকা করে দিল।

এদিকে দীপক ঠেলা নিয়ে এসেছে। ঠেলাওয়ালাকে সে বলল, ‘কী, তুমি একা পারবে? নাকি আমাকেও ধরতে হবে?’

ঠেলাওয়ালা বলল, ‘না বাবু, আমি একাই পারব।’

লোকটা শো’কেসটাকে একাই ঘাড়ে নিয়ে ঘর থেকে বের করল। কিন্তু যেই ঠেলায় তুলতে যাবে, মুচমুচে বিস্কুটের মতো অমনি সেটা ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল।

ঠেলাওয়ালা বলল, ‘বাবু, এটা তো ঘুণ একেবারে খেয়ে ফেলেছে, আগে বুঝতে পারেননি? এগুলো সময় থাকতে ঠিক করে নিতে হয়।’

সুমন মুখে কিছু বলল না। ওর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে চোখ মুছতে মুছতে ঘরে চলে গেল।

খেলাঘর

মৌসুমী মজুমদার

‘খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি’ – জানালার ধারে বসে গান শুনতে শুনতে কণা আনমনা হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল পুরোনো দিনগুলোতে। কণার বাবা ছোটবেলায় মারা যাওয়াতে দাদু-দিদিমা চার বছরের নাতনি আর নিজেদের বিধবা মেয়েকে নিজেদের কাছেই এনে রেখেছিলেন।

মামা-মামীর সংসারে দু’জন লোকের খরচা বাড়ল, পুতুলের বিয়ে-বিয়ে খেলাতে কখন যে মামী ওরই বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে বুঝতেই পারেনি।

পুতুলের খেলাঘর ভেঙে নতুন সংসারে প্রবেশ। দীর্ঘ চল্লিশ বছর কেটে গিয়েছে। ছেলে-মেয়েরা সংসারী হয়েছে। সবাই ব্যস্ত, বউমারা সন্তানদের পড়াশুনো, নাচ-গান নিয়ে ঘোড়দৌড় করছে।

কণার অবসর যাপন গান শুনে, টিভি দেখে। বর্তমানে বয়স্কজনিত নানা রোগ শরীরে বাসা বেঁধেছে। প্রেসার, সুগার-হাইপার টেনশন-অনিদ্রা ...।

অসমাপ্ত পুতুলের খেলাঘর, বত্রিশ বছর বয়সে, তিন ছেলে মেয়ে-সহ যে নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেও অথৈ জলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। সংসারসমুদ্রে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে আজ যে খেলাঘরে – সেখানে না আছে সঙ্গী, না মনের কথা শোনার মানুষ। খেলাঘরটা আদৌ বাঁধা হয়েছিল? নাকি বাঁধতে বাঁধতেই ভেঙে গিয়েছে?

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক